লোকনাট্য 'আলকাপ' : হিন্দু-মুসলমান মিলন সেতুর সেকাল-একাল

শম্পা সাহা

শুধু নাচ কিংবা গানের তুলনায় নাট্যাভিনয়ের আবেদন যেহেতু বেশি তাই এর সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি করার ক্ষমতাও অনেক ব্যাপক। যেহেতু লোকশিক্ষা এবং গণমাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য নয়, নাটক একসঙ্গে দেখা এবং শোনা যায়, তাই নাটকের পরিপূর্ণ স্বাদটুকু উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। লোকনাট্যগুলিতে সমাজ সচেতনতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তার প্রমাণ মেলে বেশকিছু রকম লোকনাট্যের উপজীব্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে। পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সাক্ষরতার প্রসার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ তথা সময় বিশেষে প্রতিকারের হদিশ (অবশ্যই নিজেদের মতো করে) এইসব পালার পরিচালক তথা কুশীলবেরা দেখিয়ে থাকেন। বস্তুতপক্ষে লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতির অন্যতম অগ্রসর মাধ্যম হওয়ায় পরিবর্তনশীল সমাজ এবং অর্থনীতির অভিক্ষেপ তার উপর এসে পড়ে অত্যন্ত দ্রুত ভাবে, যেটা সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানের অনিবার্য একটি শর্ত।

● আলকাপের প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য লোকনাট্যের সঙ্গে তুলনা

মধ্যবঙ্গের মুখ্য লোকনাট্য ধারা আলকাপ—মূলত সামাজিক বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে বলে এর মূল্যায়ন করতে হয় ভিন্নতর এক নিরিখে। যেহেতু আলকাপের শিল্পীরা মুসলিম এবং হিন্দু দুইরকম ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলি থেকেই আসেন এবং দলে এসে তাঁরা প্রায় একই পরিবারের মানুষে পরিণত হন। এইসব শিল্পীদের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও দলের মধ্যে কোনওরকম রক্ষণশীল অন্ধতা প্রশ্রয় পেতে পারে না। আলকাপ শিল্পীদের নিয়ে লেখা উপন্যাস 'বৈতালিক' এবং 'মায়ামৃদঙ্গ' (যথাক্রমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত) যারাই পড়েছেন তারা এই ধর্মগত বিভেদ-বুদ্ধি বর্জিত শিল্পী জীবনের পরিচয়টুকু অবশ্য খুঁজে পেয়েছেন যথার্থভাবে।

'গম্ভীরা' হোক কিংবা 'আলকাপ'—সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা পালার মধ্যে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তিরস্কার প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়ে ওঠে, তার উদ্দিষ্ট যাঁরা, তাদের জাত-ধর্ম ইত্যাদির বিচার করতে রেয়াত করেন না শিল্পীরা। যেমন, 'নানা' রূপী শিবের কাছে নিন্দার্হ ব্যক্তিরা হিন্দু এবং মুসলিম দুই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত থাকেন। আলকাপের পঞ্চরঙের হুল পৈতে কিংবা নুর আছে কিনা সেই বিচার করে বাঁধে না। চোকোচুন্নি এবং হালুয়া-হালুয়ানি জাতের লঘুচালের লোকনাট্যের পালাগুলিও সমাজে ধর্ম তথা সম্প্রদায়ের বিভাজনরেখাকে স্বীকার করে না। সেকথাও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

আলকাপের ইতিহাস, সংজ্ঞার্থ এবং বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ-এর ভূমিকায় লিখেছেন—সম্ভবত এই বিষয়ে প্রথম উপন্যাস শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক'। সুতরাং এটি দ্বিতীয়। উপন্যাসের চরিত্ররা নামে-স্বনামে এখনো বেঁচেবর্তে আছে এবং পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর এপার-ওপার যোজন বিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ হাটমেলায় উৎসবে-নিরুৎসবে লোকগাথা বিস্ফোরণ করছে। এই অত্যাশ্চর্য এবং ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির জনপ্রিয়তা লোকসমাজে শ্রেষ্ঠতম। আবার বলছি শ্রেষ্ঠতম। অবশ্য আরও লোকশিল্পের মতনই এর গায়েও মৃত্যুর ধূসর ছায়া পড়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! তথাকথিত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কেতাব পত্তরে এই লোকনাট্যদল 'আলকাপ'-এর যা ব্যাখ্যা বর্ণনা পড়েছি, ভাবা যায় না! শুনতে পাওয়া যায় গ্রামীণ দারিদ্র্য আর সিনেমার মারাত্মক চাপে আলকাপ এখন বিপন্ন। হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে অনেক জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্র এবং সময়ের তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু এ বইয়ের লেখক এবং রাঢ়-বরেন্দ্র ভূমির লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মনে আমৃত্যু থেকে গেল যা তা ধনপত নগরের প্রখ্যাত ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের ভাষায়—"এক বিরল মায়া।"[১]

প্রকৃতপক্ষে বিগত শতকের ষাটের দশকের শুরুতেই 'নাচিয়ে ছোকরা'র বদলে যখন থেকে মেয়েদের আলকাপে ঢোকানো শুরু হয়, মূলত তখন থেকেই আলকাপ নামক লোকনাট্য রীতিটি একেবারে মৃত। কারণ মেয়েরা ওস্তাদ ঝাঁকসা কথিত বিরল মায়াসৃষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হয়। স্বয়ং ওস্তাদ ঝাঁকসা বা ঝাঁকসুই নিজের কন্যাকে দলে ঢোকান এবং ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি আলকাপের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে সৃষ্টি করেন যাত্রাধর্মী লোকনাট্য 'পঞ্চরস'। এই পঞ্চরস, আলকাপ নয়। এর আঙ্গিক যাত্রাধর্মী। এতে চরিত্রদের প্রবেশ-প্রস্থান এবং চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরা ছাড়াও মুখে রং মাখা বা মেকাপ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলকাপের দোহাররা খঞ্জনী বাজিয়ে পাত্র-পাত্রীদের গানের ধুয়া দ্রুত থেকে দ্রুততম তালে গেয়ে চরম একটা পর্যায়ে থেমে যেত। 'পঞ্চরস' এই দোহার রীতি সম্পূর্ণ বর্জন করে। অসংখ্য গ্রামে 'পঞ্চরস অপেরা' এভাবেই গড়ে ওঠে।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ওস্তাদ ঝাঁকসার মৃত্যুর পর। তথাকথিত লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা ছোটাছুটি শুরু করেন আলকাপের খোঁজে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে প্রকৃত আলকাপের আসর চাক্ষুষ করা ছিল একেবারে অসম্ভব। ফলে তারা তৎকালীন প্রচলিত 'পঞ্চরস'কেই আলকাপ ধরে নেন। যেহেতু লোকসংস্কৃতি খাতে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। তাই সরকারি দাক্ষিণ্যের লোভেই 'পঞ্চরস' ওয়ালারা তাঁদের অনুষ্ঠানকেই 'আলকাপ' বলে চালিয়ে দিতে শুরু করেন। যেটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু ছিল না। কারণ যে আঙ্গিকের লোকনাট্যকে আলকাপ বলা হতো তা মোটামুটি ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লোকসংস্কৃতির জগত থেকে মুছে গেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওস্তাদ ঝাঁকসু ও তার পরিবার, সুধীর দাস থেকে শুরু করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পর্যন্ত আর কোনও আলকাপওয়ালাই বর্তমানে বেঁচে নেই। যখন কেউ বর্তমান নেই তখন আলকাপের অভিনয় বা আলকাপের ওয়ার্কশপ হয় কি করে ঘটনাটি যুগপৎ অবিশ্বাস্য তথা হাস্যকর।

এরপর আসতে হয় 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থে। যেহেতু সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ওঠে শব্দটির অর্থ ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে। আসলে 'আল' শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ আহ্লাদ>আল্লাদ>আল। এটি একটি পুরনো বাংলা শব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (পৃষ্ঠা ২৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৪, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) গ্রন্থে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় (১৩ অক্টোবর ১৮৩২/২৯ আশ্বিন, ১২৩৯) থেকে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির উদ্ধৃতি এরকম—

> এবং যাঁহারা আল করিবা কাল বিনাশ করিতেন, তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাড়ির আশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ-প্রমোদ পূর্বে ছিল এ বৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে।[২]

যে-কোনো ভাষা-ভাষীর ক্ষেত্রেই তাদের ব্যবহৃত সব শব্দই সেই ভাষার অভিধান-এ পাওয়া যাবে এমনটা নয়, এমনকি শব্দকোষেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এর অনেক রকম কারণ হতে পারে। হতে পারে শব্দটি অন্য ভাষার। হতে পারে প্রচলিত হতে হতে লোকমুখে এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে শব্দটির মুদ্রিত রূপ শব্দকোষ কিংবা অভিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হয়তো সে কারণেই 'আল' শব্দটি একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও শব্দটির মুদ্রিত রূপ আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও গ্রামাঞ্চলে পূর্বে লোকের মুখে শোনা যেত, 'ওর বড্ড আল হয়েছে', 'খুব আল করে বেড়াচ্ছে ও'। এখন 'আল' একটি প্রাচীন বাংলা শব্দ। যেটি প্রায় লুপ্ত। এখন শুধু বেঁচে আছে 'কাপ' অর্থাৎ নাটিকার সঙ্গে জোড় বেধে। 'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ আমোদ-প্রমোদ মূলক নাটিকা। তবে অর্থ বিস্তারে একে রঙ্গারসাত্মক বা রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক নাটিকাও বলা হয়ে থাকে। অনেকে 'আলকাটাকাপ' ও বলে থাকেন। 'কাটাকাপ' একটি চলতি বাংলা বাগধারা। এর অর্থ মূর্তিমান রঙ্গানাটিকার চরিত্র কিংবা আস্ত রঙ্গ নাটিকা। 'কাটা' শব্দটিরও অনেক অর্থ হয় বাংলায়। সুতো কাটা, ছড়াকাটা বা জাবরকাটা ইত্যাদি। অর্থবিস্তারে 'কাটা' বলতে তৈরি করাও বোঝায়। কাটাকাপের সঙ্গে আলকে জুড়ে তাই অনেকে বলে থাকেন 'আলকাটাকাপ'। 'আলকাপ' হলো ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম জেলা এবং বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগে প্রচলিত একটি লোকনাট্য শৈলী। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা জেলাতেও. 'আলকাপ' প্রচলিত।

'আল' শব্দের অর্থ 'কাব্যের অংশ' এবং 'কাপ' শব্দের অর্থ 'কাব্য'। আবার 'আল' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হলো তীক্ষ্ণ, তীব্র বা ধারালো। অপরদিকে 'কাপ' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হলো 'সঙ'। রঙ্গস্থলে বিকৃত আকারে অঙ্গ-ভঙ্গিতে দর্শকের কৌতুককর, হাস্যোদ্দীপক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিত বিষয়ের প্রতিমূর্তি বা চিত্র। আলকাপে নাচ, গান এবং এই হাস্য-কৌতুকোদ্দীপক অভিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এক একটি আলকাপ দলে দশ থেকে বারো জন শিল্পী থাকেন। এদের নেতাকে বলে 'সরদার' বা 'গুরু'। দুই বা তিনজন অল্পবয়সী শিল্পী থাকে যাদের 'ছোকরা' বলা হয়। এছাড়া এক বা দুই জন করে 'গায়েন' বা গায়ক, 'দোহার' বা সম্মেলক গায়ক, 'বাজনাদার' থাকে। 'আলকাপ'-এর মোট পাঁচটি অংশ। ১. আসর বন্দনা, ২. ছড়া, ৩. কাপ, ৪. বৈঠকি গান,

৫. খেমটাপালা। আলকাপের অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সমাজ এবং সেই সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

আলকাপের বিভিন্ন সংজ্ঞা

'আলকাপ' মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহের জনপ্রিয় লোকনাট্য। আলকাপে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই দরিদ্র শ্রেণির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। আলকাপ কোনো আনুষ্ঠানিক বা পুজো উৎসব ভিত্তিক লোকনাট্য নয়। বছরের যে-কোনো সময় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আলকাপের আসর বসে বেশি। লোকনাট্যের প্রখ্যাত সমালোচক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের ভাষায়—"আলকাপের 'কাপ' অংশটি রঙ্গরসের কৌতুকের দ্যোতক।"[৩] মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দি, ভরতপুর, বীরভূম জেলার মুরারই, নলহাটি ইত্যাদি এলাকায় আলকাপকে বলা হয় 'ছ্যাঁচড়া' জাতীয় লোকনাট্য। কারণ হিসেবে এলাকার লোকশিল্পীদের অভিমত আলকাপের মধ্যে ছ্যাঁচড়া রান্নার মত পাঁচমিশালী অনুষ্ঠান আঙ্গিক বা উপকরণ থাকে। আলকাপের 'কাপ' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' অংশে—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়া টি খেলাও দেখি সাপ।।[৪]

এখানে রঙ্গ-ব্যঙ্গাকারী অর্থে কাপ শব্দটি ব্যবহৃত। যার উৎপত্তি কাপট্য থেকে। এর অর্থ ছদ্মবেশ বা কৌতুক। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> একপ্রকার গ্রামীণ নাট্যের নাম 'আলকাপ'। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেই তা সমধিক জনপ্রিয়। যদিও অনুষ্ঠানটি ধর্মনিরপেক্ষ তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তাকে গ্রাম্য জীবন চিত্র ভিত্তিক নাটকীয় নকশা বলা যেতে পারে।[৫]

আবার আলকাপের প্রবাদপুরুষ ওস্তাদ ঝাঁকসুর অভিমত 'কাপ' ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক। আর 'আল' মানে মৌমাছির হুল। এমন কাপ যার আল আছে। অর্থাৎ আলকাপে লোককে হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রতিবাদের আকারেও তুলে ধরা হয়। সজাগ করে দেওয়া হয় জনসাধারণকে।

আলকাপের উৎস

অনেক সমালোচক মনে করেন 'আলকাপ' হলো গম্ভীরা গানের ইসলামী সংস্করণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'আলকাপ' গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ নয়। কারণ হিসেবে অনেকে উভয়ের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্যের উল্লেখ করলেও এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লোকনাট্যের সঙ্গে অন্য লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকগত কিছু মিল অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একটি থেকে যে অন্যটি সৃষ্ট তার জোরালো যুক্তি অন্তত আলকাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আলকাপের গানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। আলকাপের গানের শুরুতে আসর বন্দনায় শিব, দুর্গা, সরস্বতী, শ্যামা ইত্যাদি দেব-দেবীর বন্দনা করা হয়। এছাড়া

আলকাপের স্রষ্টা বলে যিনি সর্বজনবিদিত, তিনি হলেন অধুনা রাজশাহী শিবগঞ্জের মোনাকয়সার বোনাকানা বা বনমালী সরকার। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মেলবন্ধন "আলকাপ" লোকনাট্য। মালদা জেলার আলকাপ শিল্পীদের কেউ কেউ মনে করেন 'বোলবাহি" থেকে আলকাপ এর উৎপত্তি। তারা আলকাপের দ্বৈত সংগীতের সঙ্গে খোট্টা ভাষায় রচিত 'বোলবাহি'র দ্বৈতসংগীতের সাদৃশ্য দেখতে পান। আলকাপ এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে অপর যে অভিমত আলকাপ শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায়, তা হলো—ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে আলকাপ এর উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকার গান-বাজনা, সভা-সমিতি সবকিছু নিষিদ্ধ করলে গ্রামের শিল্পীরা বনের মধ্যে গিয়ে কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ জমিদার সেজে অভিনয় করত এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতো আলকাপ করছি। এভাবে তারা আলকাপের নাম করে অভিনয়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার-নিপীড়ন দোষ-ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তুলত। মালদা জেলার মানিকচক থানার রাইমপুর নিবাসী আলফাজ, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ মোনাকয়সার ভবতারণ সরকার, বোনাকানা প্রমুখ শিল্পী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারা ইংরেজদের কুকীর্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য এক ধরনের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এটিই পরবর্তীকালে 'আলকাপ' নামে খ্যাত হয়।

আলকাপের নিয়ম কানুন

'আলকাপ নাট্যরীতি এবং থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে আলকাপ এর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পঞ্চাশের দশকে বীরভুম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ সেইসঙ্গে বিহারের পূর্ণিয়া, দুমকা, সাঁওতাল পরগনার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে আলকাপের চাহিদা ছিল। আলকাপের দল গড়তে কমপক্ষে দশজন লোক লাগত। ওস্তাদ বা মাস্টার, সঙাল বা সঙদার বা কপে নামক একজন কৌতুক-অভিনেতা। নাচ-গান, নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দুজন ছোকরা, হারমোনিয়ামবাদক, তবলাবাদক এবং জনা চারেক দোয়ারকি।

হারমোনিয়াম-তবলা যাঁরা বাজাতেন বা যাঁরা দোহারের কাজ করতেন তাঁদেরও সময় বিশেষে অভিনয় করতে হতো। খোলা জায়গার মাঝখানে আসর বসতো, চারপাশে থাকত দর্শক। নাটকের মতো নির্দিষ্ট প্রবেশ-প্রস্থানের পথ থাকতো না। কখনো কখনো আসরে দুটো প্রতিযোগী দল থাকত। এর নাম পাল্লার আসর। দুই দল দুই দিকে বসে ঘণ্টা তিনেক ধরে অনুষ্ঠান করত। নিদেনপক্ষে বারো ঘন্টা অনুষ্ঠান না চললে দর্শকদের মন উঠত না। আলকাপের দলের প্রাণ বলা হত নাচিয়ে ছোকরা এবং কৌতুকাভিনেতাকে। ছোকরাদের বয়সের সীমা ছিল বারো থেকে কুড়ি—

নামুতে বারো ওপরে বিশ
তাতে একটু উনিশ বিশ।*

এদের তালিম শুরু হতো বারো বছর বয়স থেকেই। মেয়েদের মতন চুল, গায়ে সারাক্ষণ ফ্রক, হাতে চুড়ি, তাকে ভুলে থাকতে হতো যে সে ছেলে। চলন-বলন হতে হতো মেয়েদের মত। মোটামুটি সুন্দর মুখশ্রী এবং গানের গলা ছিল ছোকরা হবার প্রাথমিক শর্ত। বয়স পেরিয়ে গেলেও যোগ্যতা অনুযায়ী ছোকরারাই হত পুরুষ অভিনেতা, কমেডিয়ান বা ওস্তাদ। পঞ্চাশের

দশকে আলকাপ দলে কোনও আসল মেয়েকে কল্পনাই করা যেত না। আসরে বাদ্যযন্ত্র বলতে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, আর কয়েক জোড়া ছোট কত্তাল বা খঞ্জনী।

আলকাপের অভিনয় রীতি

আলকাপের সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ বিধানের জন্যই হয়তো বা বিভিন্ন দেব-দেবী, পির-দরবেশ এবং প্রখ্যাত ওস্তাদদের বন্দনা করার এই রেওয়াজ ছিল হিন্দু এবং মুসলিম নির্বিশেষে শিল্পী ও দর্শকদের একটি সার্বজনীন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রাখা হতো। এই দেবতা বন্দনা প্রথার সূত্রে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলকাপ শিল্পীদের একটা আত্মীক নৈকট্য গড়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করে সংহতির অনুভবে উদ্বুদ্ধ হওয়ারই একটা ব্যাপার অলক্ষে ঘটে যায় এর ফলে। আলকাপের একটি পালার একটি গানের মধ্যে এই সমন্বয়ের কথা বড় আবেগময় ভাবে উচ্চারিত হয়েছে—

আমরা নয়গো হিন্দু নয় মুসলমান
জাতিতে সবাই যে সমান।।
শুধু ধর্মেতে হিন্দু-মুসলমান গো
দেখুন খোদা হরি একজনা।।[৭]

নাটকের পালায় এই ধরনের কাহিনি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে সন্দেহ নেই।

আলকাপের পালার খুঁটিনাটি

আলকাপ এর শুরুতে হারমোনিয়ামের এগারো পর্দায় মুদারা অর্থাৎ স্বরগ্রামের মাঝেরটি বাজিয়ে দল সমেত কোরাসে জয়ধ্বনি। দেবী সরস্বতী থেকে শুরু করে আরো কিছু দেব-দেবী, স্থানীয় পির, এরপর ওস্তাদ তানসেন, এরপর দলের দীক্ষাগুরু এবং পরবর্তী যেসব প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আলকাপে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কারো কারো এবং শেষে দলের বর্তমান ওস্তাদের নামে প্রথাগত জয় ঘোষণা করা হয়। এরপরে হয় সমবেত বন্দনা। ছোকরা হয় মূল বন্দনা গায়ক। বাকিরা দ্রুততালে ধুয়া গায়। তারপর দু-তিন মিনিট ধরে চলে যে কোনো সুরে যন্ত্রসংগীতের বোল। ততক্ষণে নাচিয়ে ছোকরা তৈরি হয়, শুরু করে খেমটা, টপ্পা, ঝুমুর জাতীয় গান—আলকাপ এর নিজস্ব গায়েনরীতি অনুযায়ী, সঙ্গে নিয়ম করে ধুয়া গাওয়া হয়। ছোকরা কিছুক্ষণ নাচে। তারপর তাল দিতে দিতে ওস্তাদ ওঠেন। তাৎক্ষণিক কোনও বিষয় নিয়ে মুখে মুখে ছড়া বেধে গাইতে শুরু করেন। আসর নিয়ে, সেই গ্রাম নিয়ে, সমকালীন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কবিয়ালের মত মিনিট কুড়ি চালিয়ে যান। এরপর শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান কাপ বা নাটক।

কাপকে সঙও বলা হয়, কারণ আলকাপের নাটক ব্যঙ্গ-রসাত্মক। তাতে প্রচুর হাস্যকৌতুকের উপাদান থাকে। কখনও বা থাকে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম চিমটিও। যদিও কোনও লিখিত রূপ-এ ধরনের নাটকে থাকেনা, থাকেনা নির্দিষ্ট নাট্যকার। অভিনেতাদেরও সংলাপ মুখস্ত করার দায় থাকেনা। নাটকের জায়গায় থাকে একটি কাঠামো, বড়জোর একটি গল্প। সেটিই আসরের গতি-প্রকৃতি অনুসারে দর্শকদের সঙ্গে তাল রেখে এগোয়। প্রয়োজন মতো কোনও নির্দিষ্ট গল্পে সময় বিশেষে ঢুকে যায় দেশ ভাগ, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমসাময়িক তথা স্পর্শকাতর বিষয়।

যেহেতু মুর্শিদাবাদ মালদহের মুসলমান প্রধান জেলায় আলকাপ এর প্রচলন বেশি। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ, নামী সাহিত্যিকরাও একে ভুল করে মুসলিম চাষিদের গান বলে প্রান্তে ঠেলে দিতে চান। একথা ঠিক, আলকাপের শিল্পীদের একটা বড়ো অংশই ছিলেন মুসলমান এবং দর্শক শ্রোতাদের মধ্যেও মুসলিমের সংখ্যাই থাকত বেশি। যদিও হিন্দু দেব-দেবীর জয়ধ্বনি দিতে বা বন্দনা গান গাইতে তাঁরা কোনদিনই আপত্তি করেননি এবং এই বন্দনাগানের অনেকগুলির রচয়িতা মুসলমানেরাই। সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' পড়লে বোঝা যায় আলকাপ কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মঞ্চে নিয়ে এসে জাতপাতের বিভেদ মুছে দিতে পেরেছে এবং হয়ে উঠেছে গ্রাম-শহরের এক সার্বজনীন শিল্প।

তথ্যের সন্ধানে

১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : 'মায়ামৃদঙ্গ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২২/ মার্চ ২০১৬, পৃ. প্রথম সংস্করণ এর ভূমিকা অংশ—(ক)(খ)
২. পূর্বোক্ত : পৃ. দ্বিতীয় সংস্করণ এর ভূমিকা অংশ
৩. মহম্মদ নুরুল ইসলাম : 'আলকাপ', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১, পৃ. ১
৪. পূর্বোক্ত : পৃ. ২
৫. তদেব
৬. জাহিরুল হাসান : 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ', পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৬৪
৭. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৪৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অশোক গুপ্ত : 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা', সেন্ট্রাল লাইব্রেরী পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪
২. জাহিরুল হাসান : 'বহুমুখী সাহিত্যকোষ', পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪
৩. সনৎ কুমার মিত্র : 'সাহিত্যটীকা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪
৪. সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী : সংকলন ও সম্পাদনা শিশিরকুমার দাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯

আন্তর্জাতিক সহায়তা

১. bn.m.wikipedia*f*org>wiki>আলকাপ